১.

এ ছিল এক মহান বিজয়। সুলতান বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করেন। । সিরিয়া ও মিশর থেকে আলেমরা দলে দলে বাইতুল মাকদিস অভিমুখে রওনা দেন। তাকবীর ধনীতে আকাশ বাতাস কাঁপছিল। অবশেষে নব্বই বছর পর বাইতুল মাকদিসে জুমার নামাজ আদায় করা হলো। কুব্বাতুস সাখরা থেকে টেনে নামানো হলো ক্রুশ। এ ছিল এক আশ্চর্য দৃশ্য। ইসলামের বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য সবাই প্রত্যক্ষ করছিল।

- কাজি বাহাউদ্দিন ইবনু শাদ্দাদ।

হিত্তিন জয়ের ফলে সুলতান সালাহুদ্দিনের সামনে জেরুজালেম জয়ের পথ খুলে যায়। ৮৮ বছর পর মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় জেরুজালেমের পথ। অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এই সময় মুসলমানদের মনোবল ছিল তুঙ্গে। তবে এটি সত্য, হিত্তিনের লড়াই মুসলিম সেনাদের ক্লান্ত করেছিল এবং ব্যক্তিগত অসুস্থতার কারণে সুলতানের শরিরও খুব দুর্বল ছিল। কিন্তু সুলতান জানতেন হিত্তিনের পরাজয় ক্রুসেডারদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। অচিরেই তারা ইউরোপ থেকে রওনা হবে নতুন ক্রুসেডের প্রস্তুতি নিয়ে। ফলে তাকে যা করার দ্রুত করতে হবে। এ সময় সুলতানের সামনে করনীয় ছিল দুটি। প্রথমত তিনি চাইলে আক্রে ও টায়ারের মত উপকূলীয় শহরগুলি দখল করতে পারেন, যার ফলে ইউরোপ থেকে ক্রুসেডারদের সাহায্য আসার পথ বন্ধ করে দেয়া যাবে। অথবা তিনি চাইলে কিছুটা ঘুরে জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন এবং পবিত্র শহরকে ছিনিয়ে নিতে পারেন ক্রুসেডারদের হাত থেকে। সালাহুদ্দিন সিদ্ধান্ত নেন তিনি উপকূলিয় শহরগুলো জয় করে সামনে এগুবেন।

১১৮৭ সালের ৫ জুলাই ভোরে সুলতান তার সেনাদের নির্দেশ দিলেন শিবির তুলে তাবারিয়া শহরের দিকে এগিয়ে যেতে। সুলতানের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। যে কোনো মূল্যে শহরটি দখল করতে চাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় শহরের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন রেমন্ডের স্ত্রী। মুসলিম সেনাদের বিস্তৃত সারী দেখে তিনি যুদ্ধের আগ্রহ হারান। নিজের পরিবার ও সন্তানদের নিরাপত্তা দেয়ার শর্তে তিনি দুর্গের চাবি তুলে দেন মুসলিম বাহিনির হাতে । দয়ালু সুলতান শর্ত মেনে নেন। রেমন্ডের স্ত্রীকে তার পরিবার ও সম্পদসহ যে কোনো শহরে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন তিনি।

তাবারিয়া জয় হলো কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই। ক্রুসেডারদের প্রতিটি দুর্গ জেনে গেল তাবারিয়ার পতন হয়েছে। সুলতান তার সেনাবাহিনী নিয়ে উপকূলে চলে এলেন। উত্তরকে দক্ষিন থেকে আলাদা করে ক্রুসেডারদের এলাকাকে দুভাগে ভাগ করে ফেললেন তিনি। তারপর এগিয়ে গেলেন অ্যাক্রের উদ্দেশ্যে। দূর থেকে দেখা গেল অ্যাক্রে দুর্গের সুউচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের শীর্ষে পতপত করে উড়ছিল ক্রুসেডারদের পতাকা। বাহ্যত মনে হচ্ছিল ক্রুসেডারদের শিবির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ইমাদুদ্দিন ইস্ফাহানী ধরতে পেরেছিলেন মূল বিষয়। তিনি লিখেছেন, ক্রুসেডারদের অন্তরগুলো ভয়ে কাঁপছিল পতাকার মতই।

একদিন অপেক্ষা করে সুলতান নির্দেশ দিলেন দুর্গের প্রাচিরের গায়ে সিজ ইঞ্জিন বসাতে। অ্যাক্রের সেনারা যুদ্ধ এড়াতে চাচ্ছিল। তারা ভালো করেই জানতো সালাহুদ্দিন আইয়ুবির এই বাহিনীর সাথে লড়াই করার সামর্থ্য নেই তাদের। শহরের বাসিন্দারা নিরাপত্তা চেয়ে বের হয়ে আসে। সুলতানের সেনারা তাদেরকে কোনো আঘাত না করে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করে তাদের সাথে। এভাবেই কোনো যুদ্ধ ছাড়া জয় হয় অ্যাক্রে। সালাহুদ্দিন জুমার নামাজ আদায় করলেন শহরের মসজিদে। ফকিহ জামালুদ্দিন আবদুল লতিফ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। এভাবে ৯০ বছর পরে আবারও এই মসজিদে উচ্চারিত হলো তাকবির ধবনী। মাঝের সময়টায় খ্রিস্টানরা এই মসজিদকে গির্জা হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

অ্যাক্রে জয়ের পর সালাহুদ্দিন কিছুটা নিশ্চিন্ত হন। তিনি সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতে থাকেন। তিনি নিজে হাইফা, নাজারেথ ও সাফফারিয়া শহর দখলে নেন। নাবলুস ছেড়ে দেন

সেনাপতি হুসামুদ্দিনের হাতে। টায়ার ও তিবনিন জয়ের জন্য পাঠানো হলো তকিউদ্দিনকে। কিন্তু পরিস্থিতি সংকটে পড়ে যায়, যখন তকিউদ্দিন তিবনিনে তীব্র বাধার মুখোমুখি হন। বাধ্য হয়ে তিনি সালাহুদ্দিনের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। সাহায্য এসে পৌঁছলে তিনি তিবনিন জয় করে নেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে বিতাড়িত ক্রুসেডারদের একটি অংশ এ সময় টায়ারে জড়ো হয়। সুলতান ভেবে দেখলেন এখন শহরটি জয় করতে হলে সময় দিতে হবে। অবরোধ দীর্ঘ হতে পারে। এই চিন্তা থেকে সুলতান সিদ্ধান্ত নেন তখনকার মত টায়ারকে এড়িয়ে তিনি সিডন ও বৈরুতের দিকে এগিয়ে যাবেন। এ সময় সুলতানের মূল টার্গেট ছিল জেরুজালেম। তিনি চাচ্ছিলেন যত দ্রুত সম্ভব শহরটিকে জয় করতে। মিশরে বসে পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন আল আদিল। তিনিও এক পত্রে জেরুজালেম জয়ের তাগাদা দিলেন সালাহুদ্দিনকে।

'এই শহরটি জয় করতে আপনি দায়বদ্ধ। আজ যদি আপনি জেরুজালেম জয় না করেন তাহলে মনে রাখবেন এই শহরটি ক্রুসেডারদের হাতেই থাকবে' " লিখেছিলেন আল আদিল।

মূলত নুরুদ্দিন জেংগির সময় থেকেই মুসলমানরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল এই শহর জয়ের জন্য। নুরুদ্দিন জেংগি মসজিদে আকসাতে প্রতিস্থাপন করার জন্য একটি মিম্বরও নির্মান করেছিলেন। জেরুজালেম ছিল মুসলমানদের জন্য একটি আবেগের নাম। এই শহরের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিয়ে মুসলমানরা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল।

জেরুজালেম। মুসলিমদের সামনে গন্তব্য ছিল জেরুজালেম। কৌশলগত দিক থেকে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ কিনা এটি তখন বড় প্রশ্ন ছিল না। কারণ এই শহরের তুলনা ছিল এই শহরই। এই শহরের সাথে মিশে ছিল মুসলমানদের বিশ্বাস, চেতনা ও আবেগ। ১১৭৪ সাল থেকে সালাহুদ্দিন এই শহর জয়ের জন্য বাগদাদের আব্বাসি খলিফাকে লিখছিলেন। নানাভাবে জনতার মাঝে চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। এই কাজে তাকে কাছ থেকে সাহয্য করেছিলেন তার দুই উপদেষ্টা ইমাদুদ্দিন ইস্ফাহানি ও কাজি ফাজিল।

উপকূল ছেড়ে জেরুজালেম যাওয়ার আগে সালাহুদ্দিন সিদ্ধান্ত নেন আসকালান দখল করতে হবে। আসকালানের শাসক গাই অব লুসিগনান আগ থেকেই সুলতানের কাছে বন্দি ছিলেন। বন্দি গাইকে সাথে নিয়ে সালাহুদ্দিনের বাহিনী এসে উপস্থিত হলো আসকালানের সামনে। আসকালান ছিল দক্ষিনের প্রধান বন্দর। বারো ফুট উচু প্রাচিরের আড়ালে নিরাপদ ছিল শহরটি। এখান থেকে মক্কার দিকে চলে গেছে ক্যারাভান রুট। মুসলমানদের কাছে যা পরিচিত ছিল সিরিয়ার কনে নামে। সুলতান গাইকে প্রস্তাব দিলেন, তিনি যদি শহরবাসীকে আত্মসমর্পনে রাজি করাতে পারেন তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। গাই সম্মত হলেন এই প্রস্তাবে। দুর্গের প্রাচীরের সামনে রেখে আসা হলো তাকে। গাই সাধ্যমত চেষ্টা চালালেন কিন্তু কাজ হলো না। শহরবাসী গাইকে কাপুরুষ বলে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল। সুলতান বুঝতে পারলেন সোজা আংগুলে ঘি উঠবে না। তিনি অবরোধ শক্ত করার আদেশ দিলেন। তীব্র আক্রমনের সামনে পতন হয় আসকালানের।

ঠিক এ সময়টায় জেরুজালেমে শুরু হয় খাদ্য সংকট। হিত্তিনের যুদ্ধ হয়েছিল ফসল কাটার মৌসুমে, ফলে সময়মত ফসল কাটা হয়নি। এদিকে আশপাশের এলাকা থেকে ক্রুসেডারদের অনেকে এসে আশ্রয় নেয় জেরুজালেমে, এক লাফে নগরির জনসংখ্যা দ্বিগুন হয়ে যায় এই সময়, ফলে খাদ্য সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠে।

সালাহুদ্দিন এগিয়ে এলেন জেরুজালেমের দিকে। ক্রুসেডার দুর্গগুলো অসহায়ের মত দেখছিল সুলতানের যুদ্ধযাত্রা। ২০ সেপ্টেম্বর মুসলিম বাহিনী গেইট অব ডেভিডের উলটো দিকে পশ্চিম পাহাড়ে শিবির গাড়ে।

ক্রুসেডারদের একজন সেনাপতি বালিয়ান ডি ইবিলিন হিত্তিনের যুদ্ধে বন্দি হয়েছিলেন সালাহুদ্দিনের হাতে। আর কখনো মুসলমানদের সাথে লড়াই না করার শর্তে মুক্তি দেয়া হয়েছিল তাকে। বালিয়ান মুক্তি পেয়ে চলে আসেন জেরুজালেমে। তার ইচ্ছা ছিল এখানে অবস্থান করা তার পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নিবেন তিনি। সালাহুদ্দিন যখন জেরুজালেম অবরোধ করেন তখন এখানকার ক্রুসেডাররা বালিয়ানের নেতৃত্বে লড়াই চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বালিয়ান তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন এই বলে, আমি ওয়াদা করেছি আমি তার বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করবো না। কিন্তু ক্রুসেডাররা বালিয়ানকে বাধ্য করে লড়াই করতে। হতাশ বালিয়ান সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠান সালাহুদ্দিনের কাছে। তাতে তিনি জানান পরিস্থিতির চাপে তিনি বাধ্য হয়ে অস্ত্র ধরছেন সুলতানের বিরুদ্ধে। তবে তার আশা তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন দয়ালু সুলতান। ফিরতি বার্তা এলো সালাহুদ্দিনের পক্ষ থেকে। তাতে তিনি জানালেন, তিনি সমস্যাটি বুঝতে পেরেছেন। বালিয়ানের পরিবারকে তিনি দেখবেন।

সালাহুদ্দিন যখন জেরুজালেম অবরোধ করেন তখন তার সাথে আলেম, ফকিহ ও সুফিদের অনেকেই ছিল। তারা এসেছিলেন সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য এলাকা থেকে। তারা সকলেই এই জিহাদে অংশ নিয়ে উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে চাচ্ছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নিজেও আবেগে আক্রান্ত হয়েছিলেনে এই সময়। যে শহর জয়ের জন্য বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করেছেন তিনি, সেই শহর আজ তার সামনে উপস্থিত।

মুসলিম বাহিনীর আগমনের পর জেরুজালেমের ভেতর শুরু হয় যুদ্ধের প্রস্তুতি। খ্রিস্টানরা কোনোভাবেই এই শহর হাতছাড়া করতে চাচ্ছিল না। ঐতিহাসিক ইবনুল আসির সে সময়কে চিত্রায়ন করেছেন এভাবে, খ্রিস্টানরা মুসলমানদের হাতে শহর ছেড়ে দেয়ার চেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বেশি প্রস্তুত ছিল। তারা এই শহর রক্ষার জন্য নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল।

সালাউদ্দিন জেরুজালেম ঘেরাও করলেন। ঐতিহাসিক ইমাদুদ্দিন ইস্ফাহানির মতে এ সময়য় শহরে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬০ হাজারের মত। তবে এদের মধ্যে পেশাদার সেনাসংখ্যা কম। বেশিরভাগ ছিল সাধারন মানুষ, যারা কোনো ভাবেই এই শহরের অধিকার হারাতে চাচ্ছিল না। সুলতান টানা ৫ দিন শহরের চারপাশে চক্কর দিয়ে এর দূর্বল জায়গা চিহ্নিত করার চেষ্টা চালালেন। এই ৫ দিন কোনো যুদ্ধ হলো না। ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ক্রুসেডাররা দেখলো সুলতানের বাহিনী শিবির তুলে নিচ্ছে। বিষয়টি ছিল অপ্রাত্যশিত। শহরে খুশির হল্লা বয়ে যায়। ক্রুসেডাররা আনন্দে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে থাকে।

পুরো ব্যাপারটিই ছিল সুলতানের যুদ্ধ কৌশল মাত্র। মূলত তিনি সেনাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন। পশ্চিম দিক থেকে শিবির তুলে তিনি সেনাদের উত্তর দিকে নিয়ে যান। এই অংশে বড় কোনো ফটক ছিল না, যেখান থেকে ক্রুসেডাররা পালটা আক্রমন করতে পারবে। সুলতান এই বিষয়টি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত নিলেন এই অংশেই আগে আক্রমন করা হবে। রাতেই সুলতানের নির্দেশে প্রাচীরের গায়ে বসানো হলো সিজ ইঞ্জিন। প্রাচীর ভেংগে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালো মুসলিম সেনারা। মুসলিম বাহিনীর মিনজানিকগুলো একটানা পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে প্রাচীরের গায়ে। পালটা জবাব দিতে ক্রুসেডারদের মিনজানিকগুলোও মরিয়া হয়ে উঠে। ক্রুসেডারদের একাংশ আচমকা ফটক খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা সুলতানের বাহিনির সাথে তীব্র লড়াই চালায়। এই লড়াইয়ের জের ধরে কিছুক্ষন মিনজানিকগুলো বন্ধ থাকে। সেদিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হয় কোন ফলাফল ছাড়া। পরদিন ক্রুসেডাররা আবারও শহরের বাইরে এসে হামলা চালায়। তীব্র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে সুলতানের বিশিষ্ট সেনাপতি ইযযুদ্দিন আইশ নিহত হন। তার মৃত্যুর সংবাদে মুসলিম শিবিরে ক্রোধ ও প্রতিশোধের নেশা জেগে উঠে। তারা তীব্র আক্রমন চালায় ক্রুসেডারদের উপর। এই হামলা প্রতিহত করতে না পেরে ক্রুসেডাররা দ্রুত শহরে ফিরে যায়ে এবং ফটক আটকে যায়। সুলতান আবারও প্রাচীরের দিকে মনোযোগ দেন।

ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেন প্রাচীরের কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলতে। কাজটা সহজ ছিল না। ক্রুসেডাররা অবস্থান করছিল প্রাচীরের শীর্ষে। তারা সেখান থেকে তীর, পাথর ও গরম তেল নিক্ষেপ করছিল নিচে কর্মরত শ্রমিকদের উপর। বাধ্য হয়ে সুলতান শ্রমিকদের ফিরে আসার নির্দেশ দেন। আবারও মিনজানিক থেকে শুরু হয় একটানা পাথর বর্ষন। একই সাথে প্রাচীরের গায়ে ছুড়ে মারা হয় দাহ্য পদার্থ। তীরন্দাজদের একাংশ সেই দাহ্য পদার্থ বরাবর আগুনের সলতে লাগানো তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে প্রাচীরের গায়ে নানা স্থানে আগুন ধরে যায়। মুসলিম বাহিনী চাচ্ছিল ক্রুসেডারদের প্রাচীর থেকে সুরাতে। কারণ তাদের না সরালে কাজ চালানো যাচ্ছিল না। পাথরের পতনের শব্দ ও সৈনিকদের কোলাহল সেদিন জেরুজালেমের উত্তর অংশকে উত্তপ্ত করে রেখেছিল।

উড়ন্ত তীর ও পাথর মাঝ দিয়ে ডোম অব রকের সোনালী গম্বুজ চোখে পড়লো সুলতানের। কল্পনার চোখে তিনি দেখলেন মসজিদে আকসায় আজান হচ্ছে যে আজান বন্ধ আছে ৮৮ বছর ধরে। আগ্রহের আতিশয্যে তিনিও ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধরত সেনাদের মাঝখানে চক্কর দিতে থাকেন।

যুদ্ধের তৃতীয় দিন ভোরে মুসলিম সেনারা প্রাচিরের ছোট একটি অংশ ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়। প্রাচিরের উপরে অবস্থানরত ক্রুসেডাররা হতাশ চোখে দেখলো এই দৃশ্য। তাদের কেউ কেউ নিচে নেমে মানবপ্রাচীর তৈরী করে ভাংগা অংশ আটকে দেয়ার চেষ্টা চালায় কিন্তু মুসলমানদের আক্রমনে ফাটল ক্রমেই বড় হতে থাকে। প্রাচীরের এই ফাটলের সংবাদ পৌছে যায় শহরের ভেতরে। সেখানে নেমে আসে হতাশা ও দুশ্চিন্তা। লোকেরা গির্জায় জড় হয়ে কান্না করতে থাকে। তারা পাদ্রীদের সামনে বসে নিজেদের অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয়। কিন্তু স্ট্যানলি লেনপুলের ভাষায়, স্রষ্টা এই শহরের পাপাচার ও প্রবৃত্তি উপাসনা দেখে রুষ্ট হয়েছিলেন। পাপে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের প্রার্থনা তিনি সেদিন শোনেননি।

প্রাচীরের ফাটল বড় হতে থাকে। স্পষ্ট হয়ে উঠে ক্রুসেডারদের সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে। হয় অস্ত্র সমর্পন অথবা লড়াই করে মৃত্যুবরণ। ক্রুসেডাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পন করাই উত্তম হবে। দ্রুত ক্রুসেডাররা একটি প্রতিনিধিদল প্রস্তুত করে । শহরের ফটক খুলে এই দল রওনা হয় মুসলিম শিবিরের উদ্দেশ্যে। বালিয়ান ডি ইবিলিন পৌছলেন সুলতানের তাবুতে। দীর্ঘ আলোচনা চললো দুই সেনাপতির মধ্যে। সিদ্ধান্ত হলো শহরবাসীকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হবে। তবে তারা মুসলমান বাহিনীর বন্দি হিসেবে বিবেচিত হবে। মুক্তি পেতে চাইলে পুরুষরা দশ দিনার, মহিলারা পাঁচ দিনার এবং শিশুদের জন্য দুই দিনার দিতে হবে। সুলতানের সাথে ক্রুসেডার প্রতিনিধিদের আরিও কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সন্ধির সকল শর্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ঘোষনা দেয়া হয় মুক্তিপন আদায়ের জন্য ৪০ দিন সময়য় দেয়া হবে। এই সময়ের মধ্যে যে মুক্তিপন দিতে না পারবে সে দাস হিসেবে বিবেচিত হবে। শহরের সকল পদস্থ ও অভিজাত শ্রেনীর ব্যক্তিরাও এই শর্তের মধ্যে পড়বে।

১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর ক্রুসেডারদের সাথে মুসলমানদের লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেদিনই আল কুদস তুলে দেয়া হয় মুসলমানদের হাতে।

এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের সেই স্মরনীয় দিন, যেদিন পবিত্র ভূমির মাটি স্পর্শ করছিল মুসলিম মুজাহিদদের পা। মুসলমানদের চেহারা ছিল উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর। তাদের খুশির কোনো সীমা ছিল না। শহরের সুউচ্চ সকল স্থান থেকে ক্রুসেডারদের পতাকা নামিয়ে সেখানে গেড়ে দেয়া হয় ইসলামের পতাকা। বাতাসে পত পত করে উড়ছিল তা।

২.

সুলতান বসেছিলেন আনন্দ ঝলমল চেহারায়।

- আবু শামাহ

৭ রজব, ৫৮৩ হিজরি, শুক্রবার। বাইতুল মুকাদ্দাস।

ভোরের সূর্য আলো ছড়ালো ডোম অব রকের শীর্ষদেশে। নৈশ প্রহরীরা আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুললো, রাতজাগা ক্লান্তিতে তাদের দুচোখ বুঝে আসছে। আস্তাবল থেকে পশুদের ডাক শোনা গেল। ধীরে ধীরে ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হয়ে এলো লোকজন। নতুন দিনের সূচনা ঘটেছে পবিত্র শহরে, যদিও এই দিনটি অন্যদিনের মত নয়। মুসলমানদের হাতে পতন ঘটেছে বাইতুল মুকাদ্দাসের। আজই তাদের জন্য খালি করে দিতে হবে এই শহর।

২৭ শে রজব তারিখটিকে ঘিরে মুসলমানদের রয়েছে ঐতিহাসিক স্মৃতি। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে এই তারিখে রাতের বেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজ হয়েছিল। বোরাকে আরোহণ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসে। এখানে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের জামাতের ইমামতি করেছিলেন তিনি। আল্লাহর কুদরত, প্রায় ছয়শো বছর পর এই তারিখেই আল্লাহ মুসলমানদের হাতে তুলে দিলেন পবিত্র শহরের চাবিকাঠি।

'আশ্চর্য ঘটনা দেখুন। আল্লাহ মুসলমানদের হাতে এই শহর তুলে দিলেন সেই তারিখে, যে তারিখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজ হয়েছিল' উচ্ছ্বাসের সাথে লিখেছেন বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ।

বাইতুল মুকাদ্দাসে সূচনা হলো বিষণ্ন এক দিনের। ক্রুসেডারদের সময় কাটছিল শংকায়। যদিও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী সবাইকে জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি যদি মত বদলে ফেলেন? ৮৮ বছর আগে ক্রুসেডাররা বাইতুল মাকদিসে যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তিনি যদি তার পুনরাবৃত্তি করেন?

বিরস চেহারা নিয়ে বৃদ্ধরা বারবার তাকাচ্ছিলেন শহরের প্রাচীরের দিকে। একটু পরেই মুসলমান বাহিনীর জন্য খুলে দেয়া হবে এটি। কেউ জানে না কী ঘটবে তারপর।

দ্বিপ্রহরের একটু আগে মুসলমানদের জন্য খুলে দেয়া হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের ফটক। জোয়ারের স্রোতের মত মুসলিম বাহিনী প্রবেশ করে শহরের ভেতরে। সবার দৃষ্টি ডোম অব রকের দিকে। এত কাছ থেকে এটিকে দেখে আনন্দে বিহ্বল সবাই। সুলতান সালাহুদ্দিন নিজেও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এর দিকে। এই প্রথমবারের মত এটিকে দেখছেন তিনি। মুসলিম সেনারা স্রোতের মত এগিয়ে গেল মাসজিদুল আকসার দিকে। ডোম অব রকের পর বড় একটি স্বর্ননির্মিত ক্রস লাগানো। দ্রুত কয়েকজন সেনা উঠে গেলেন ডোম অব রকের উপর। ক্রুসেডার ও মুসলিম সেনাদের চোখের সামনে নামিয়ে ফেলা হলো ক্রস। তাকবির ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো বাইতুল মুকাদ্দাস শহর। ক্রুসেডারদের কারো কারো চোখে এ সময় অশ্রু ঝরছিল।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ইচ্ছা ছিল মাসজিদুল আকসায় জুমার নামাজ পড়বেন, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। মসজিদে আকসার পশ্চিম দিকে ক্রুসেডাররা টয়লেট ও আস্তাবল নির্মান করেছে। প্রথমে এগুলো গুড়িয়ে দিতে হলো। মসজিদের ভেতর নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিল নাপাকি। এসব পরিষ্কার করতে করতে জুমার সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। ফলে সুলতান ও সেনারা বাইরেই নামাজ পড়ে নেন।

দ্রুতই এই বিজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র। নানা স্থান থেকে দলে দলে লোক ছুটতে থাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে। তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য সুলতান একটি শুকরিয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। শহরের বাইরে শামিয়ানা টাঙ্গানো হয়। সুলতান ও তার সভাসদরা শামিয়ানার নিচে বসে আগন্তুকদের সাথে দেখা করেন। পুরো সময়টা সুলতানের চেহারা ছিল প্রফুল্ল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল মাথা থেকে অনেক বড় চিন্তার বোঝা সরিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস নিচ্ছেন তিনি।

-

যদিও বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের সংবাদ রাতারাতি ছড়িয়ে গেছে বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু তখনো পর্যন্ত সুলতানের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো পত্র যায়নি কারো কাছে। সভাসদরা তাড়া দিলেন দ্রুত যেন পত্র পাঠানো হয় বিভিন্ন এলাকার শাসকদের কাছে।

পরদিন ভোরে সূর্যের প্রথম কিরণের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন সুলতানের কাতেব ইমাদুদ্দিন ইস্ফাহানি। তিনি বৈরুতের অবরোধে আহত হয়ে দামেশকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। চিকিৎসা শেষেই সংবাদ পেলেন বাইতুল মুকাদ্দাস জয় হয়েছে। বিন্দুমাত্র দেরি না করে তিনি ছুটে এলেন সুলতানের কাছে। কুশল বিনিময়ের পর সুলতান তাকে আদেশ দিলেন এই বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পত্র পাঠাতে।

'সেদিনই বিভিন্ন শহরে ৭০টি পত্র পাঠানো হয়' লিখেছেন ঐতিহাসিক আবু শামাহ।

বাগদাদের আব্বাসি খলিফা নাসির লি দিনিল্লাহর কাছে পাঠানো পত্র লেখা ছিল, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তার বান্দাদের জন্য তার প্রতিশ্রুত ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তিনি মুশরিক ও অবাধ্যদের উপর তাওহিদকে বিজয় দান করেছেন।

কাজি ফাজিল অবস্থান করছিলেন দামেশকে। তার কাছে লিখিত পত্রে বলা হয়, 'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ জাহিল ও নির্বোধদের উপর আহলুল ইলম ও নেককারদের বিজয় নিশ্চিত করেছেন। এখন আমরা এবং এই শহর আপনার আগমনের অপেক্ষায় আছি কারণ আমরা জানি, এই জয়ের পেছনে আপনার দোয়ার রয়েছে অনেক বড় অবদান।

বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের সংবাদ শুনে কবিরা কাব্য রচনা করতে থাকেন। ইমাদুদ্দিন ইসফাহানি তার লিখিত এক কবিতায় বলেন,

'সেপাই ছিলেন ফেরেশতারা, ভাবলো তবু শত্রুদল।

মানুষ তো নয় জ্বীন-দানবেই বইয়ে দিল খুনের ঢল।

আকসা জয়ের মুকুট সেতো তোমার শিরেই মানায় বেশ,

ঠিকই তোমার হাতেই হলো আকসা বিজয় অবশেষ।

তোমার অসি আকসা-ভূমির কুফর শিরক করলো লীন,

করলো কায়েম ভ্রান্তি-নেফাক বিনাশকারী সত্য দ্বীন।

খোদার ঘরে খোদার বিধান প্রতিষ্ঠিলে তুমিই ফের,

সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে সন্যাসী ও যাজকদের'। (কাব্যানুবাদ- হেমায়েতউল্লাহ)

-

বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশের দিন মুসলমানরা মাসজিদুল আকসাতে জুমার নামাজ পড়তে পারেনি। সুলতান সালাহুদ্দিন বিষয়টি নিয়ে মনোকষ্টে ভুগছিলেন। তিনি সালারদের নির্দেশ দেন, যে কোনো মূল্যে পরবর্তী জুমা মসজিদুল আকসাতে পড়তে হবে। মাসজিদুল আকসা থেকে যিশু ও মেরির সকল মূর্তি সরানো হয়। মসজিদের যেসব অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ক্রুসেডারদের হামলায় তা মেরামত করা হয়। পুরো মসজিদকে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করা হয়। নতুন সাজে সেজে উঠে মসজিদটি।

মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশের ৮ দিন পর শাবান মাসের ৪ তারিখে মসজিদুল আকসাতে সমবেত হলো জুমার নামাজ আদায় করতে। সেদিন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। অনেক দূর দূর থেকে মুসলমানরা এলো মসজিদুল আকসায় জুমা পড়তে। ৮৮ বছর পর আবার এই মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে জুমা। সবাই চাচ্ছিল ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হতে। আজান হওয়ার আগেই মসজিদ ভরে যায়। মসজিদের বাইরেও নামাজের ব্যবস্থা করা হয়। কাতারগুলো ডোম অব রক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী অবস্থান করছিলেন শেষ কাতারে, সেই কাতারের উপর ছায়া দিচ্ছিল কুব্বাতুস সাখরা।

এই বিশেষ দিনে জুমার নামাজের খুতবা ও ইমামতির দায়িত্ব ছিল অনেক মর্যাদার বিষয়। লোকজন সকাল থেকেই অনুমান করার চেষ্টা চালায়, এই মহান সৌভাগ্যের অধিকারী কে হতে যাচ্ছেন। জুমার আজানের পর সবার কৌতুহলের সমাপ্তি হলো। সুলতানের নির্দেশে ধীরে ধীরে মিম্বরের দিকে এগিয়ে গেলেন দামেশকের কাজি মুহিউদ্দিন আবুল মাআলি।

এতক্ষণ ধরে চলা মৃদু গুঞ্জন থেমে গেল। সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলে কাজি সাহেবের দিকে। তিনি দৃঢ় পদে হেটে গেলেন মিম্বরের দিকে। নির্ধারিত আসনে বসে পড়লেন। মুয়াজ্জিন উঠে দাঁড়ালো আজান দিতে। আজান শেষে কাজি সাহেব উদ্দীপ্ত কন্ঠে খুতবা শুরু করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও নবিজির প্রতি দরুদ পাঠ করেন। তারপর চার খলিফার প্রতি প্রশংসাবাক্য পাঠ করে আলোচনা শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের কথা বর্ননা করে শুকরিয়া আদায় করেন। তার কন্ঠে খেলা করছিল আবেগ, ভাষায় ছিল জাদু, শব্দচয়নে ছিল পরিমিতবোধ। খুতবায় তিনি মুসলিম মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বলেন,

আপনারা কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের ইতিহাস আবার তাজা করে দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাদের প্রচেষ্টা ও কোরবানি কবুল করে নিক। আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করেছেন, আপনারা এই নেয়ামতের হক আদায় করুন। বিনিময়ে আল্লাহ আপনাদেরকে জান্নাত দান করবেন, যা সৌভাগ্যবানদের বাসস্থান।

যতক্ষণ আপনারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করবেন, আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করবেন। এখন আপনারা সচেষ্ট হোন। যেখানেই কুফর শিরক মাথাচাড়া দিচ্ছে তার মূলোৎপাটনের চেষ্টা করতে থাকুন। আল্লাহর জমিনকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে মুক্ত করুন। আপনারা সুলতানকে সাহায্য করুন। তার হাত মজবুত করুন। ইনি সালাহুদ্দিন ও সালাহুদ্দুনিয়া। দ্বীন ও দুনিয়ার মুসলিহ। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সুলতান। তিনিই বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করেছেন। ইনি আইয়ুবের ছেলে ইউসুফ, যিনি আব্বাসি খিলাফতকে নতুন করে প্রাণ দিয়েছেন।

হে আল্লাহ, আপনি তার শাসনকে সুদৃঢ় করুন। ফেরেশতাদেরকে তার সাহায্যকারী বানান। দ্বীনে হানিফের জন্য তার প্রচেষ্টার উত্তম বদলা দিন তাকে। মুসলিম উম্মাহর জন্য তার খেদমতকে কবুল করুন। তিনি যে চিন্তা নিয়ে সামনের দিকে এগুচ্ছেন, পূর্বে ও পশ্চিমে সেই বার্তা পৌছে দিন। আপনি যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাস আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন এভাবে পৃথিবীর কোনে কোনে মুসলমানদের বিজয় লিখে দিন।

-

জুমার নামাজের পর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী মিম্বরে বসেন। তিনি কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। তার আলোচনায় তিনি জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরে জিহাদের প্রতি উপস্থিতদের উদ্বুদ্ধ করেন।

-

আল কুদস জয়ের ফলে পুরো ফিলিস্তিন চলে এলো মুসলমানদের হাতে। ফিলিস্তিনের এক ইঞ্চি ভূমিও আর ক্রুসেডারদের হাতে রইলো না। চুক্তির শর্ত ছিল ক্রুসেডাররা চল্লিশ দিনের মধ্যে মুক্তিপন আদায় করে বাইতুল মুকাদ্দাস ছেড়ে যাবে। শহরে মুসলমানদের প্রবেশের পর প্রথম সপ্তাহ গেল প্রশাসনিক অবকাঠামো ঢেলে সাজাতে। এই সময় শহরের ফটকে বসানো হলো কড়া প্রহরা, যেন মুক্তিপন আদায়ের আগে কেউ শহর ছেড়ে যেতে না পারে। ইমাদুদ্দিন ইস্ফাহানির মতে শহরের মোট বাসিন্দার সংখ্যা ছিল এক লাখের মতো। ইবনুল আসির লিখেছেন, শহরের প্রতিটি চার্চ ও গলি মানুষের ভীড়ে গিজগিজ করতো।

এক সপ্তাহ পর শুরু হলো মুক্তিপন আদায়। সুলতান জানতেন, এত বেশি সংখ্যক মানুষের মুক্তিপণ সুষ্ঠভাবে আদায় করাটা বেশ কঠিন, ফলে তিনি পুরো ব্যবস্থাটি নিখুঁতভাবে সাজানোর চেষ্টা করেন। প্রচুর সেনা নিয়োজিত করা হয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। সেনাদের তদারকির দায়িত্ব অর্পন করা হয় কয়েকজন সেনাপতির কাঁধে। বাইতুল মুকাদ্দাস খুব দ্রুতই থমথমে হয়ে উঠে। সুলতানের আপ্রান চেষ্টা ছিল কোনোভাবেই যেন শহরের কোনো অমুসলিমকে কষ্ট দেয়া না হয়। শহরের প্রতিটি ফটকে সুলতানের কর্মকর্তারা মুক্তিপন আদায় করছিলেন। উদাস ও নির্বিকার চেহারা নিয়ে ক্রুসেডাররা মুক্তিপন আদায় করছিল। পুরুষরা ১০ দিনার , মহিলারা ৫ দিনার এবং শিশুরা ২ দিনার করে আদায় করে শহর ছেড়ে বের হয় দুরের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

মুক্তিপন আদায়ের শুরুটা হয়েছিল বালিয়ান ডি ইবিলিনের হাত ধরে। দিনের শুরুতে গেইট অব ডেভিডের সামনে ৭০০০০ দিনার আদায় করে সে ৭০০০ দরিদ্র খ্রিস্টানকে শহর থেকে বের করে আনে। এরপর প্রতিটি ফটকে শুরু হয় ক্রুসেডারদের বিদায়যাত্রা। ধনীদের জন্য এই সামান্য অর্থ পরিশোধ করে শহর ত্যাগ করা কঠিন ছিল না, কিন্তু দরিদ্রদের অনেকেই অর্থাভাবে আটকা পড়লো। ধনীরা এ সময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, অন্যদিকে তাকানোর ফুরসত বা ইচ্ছা কোনোটাই তাদের ছিল না।

সূত্রঃ

১। আল কামিল ফিত তারিখ – ইবনুল আসির।

২। আর রওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন – আবু শামাহ।

৩। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি শখসিয়্যত ও কারনামে – ইসমাইল রেহান।

৪। আন নাওয়াদিরুস সুলতানিয়্যা – বাহাউদ্দিন বিন শাদ্দাদ।

৫। দ্য ক্রুসেডস দ্য ফ্লেইম অব ইসলাম – হ্যারল্ড ল্যাম্ব।

(অসমাপ্ত)